

প্রচলিত মানহাজ

(ইসলামি শরিয়ত মতপার্থক্যপূর্ণ মাসয়ালার কারণ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ)

আসলাম হোসাইন



গাডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

সূচিপত্র

ইফতিরাক বনাম ইখতিলাফ	১১
কোনো ইমামের সব হাদিস জানা ছিল না	১৪
দাদির মিরাস-সংক্রান্ত হাদিস আবু বকর (রা.)-এর জানা ছিল না	১৫
মাসয়ালা সম্পর্কিত কিছু হাদিস উমর (রা.)-এর জানা ছিল না	১৬
মাসয়ালাসংক্রান্ত কিছু হাদিস উসমান (রা.)-এর জানা ছিল না	১৬
বিধবার ইদতকালসংক্রান্ত হাদিস আলি (রা.)-এর জানা ছিল না	১৭
মতবিরোধের কারণ	১৭
অনুসরণ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের	২০
তাকলিদের সংজ্ঞা	২৪
আল্লামা শামি (রহ.)-এর অভিমত	২৬
ইমাম ইবনে হুমাম (রহ.)-এর অভিমত	২৬
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর অভিমত	২৮
আল্লামা গুরনবুলালি (রহ.)-এর অভিমত	২৭
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর অভিমত	২৮
মাওলানা মওদুদী (রহ.)-এর অভিমত	২৯
শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি (রহ.)-এর অভিমত	৩০
শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালাহ আল উসাইমিন (রহ.)-এর অভিমত	৩১
আহলে হাদিস বনাম হানাফি মাজহাব	৩২
মুসলমানরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত	৩২
হানাফিদের বাড়াবাড়ি	৩৩
আহলে হাদিসের বাড়াবাড়ি	৩৫
উগ্রপন্থা নয়, মধ্যমপন্থাই কাম্য	৩৮

মতবিরোধপূর্ণ সব বিষয়ই সাহাবিদের আমল	৩৯
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর বক্তব্য	৪০
মাওলানা তাকি উসমানির মন্তব্য	৪১
বিভক্তি, দলাদলি ও হিংসা-বিদ্বেষ	৪২
চার মাজহাব কি চারটি ফেরকা	৪৪
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৪৬
প্রকৃত আহলে হাদিস ও প্রকৃত হানাফি কেউ নয়	৪৯
আল্লাহ কোথায় আছেন	৫৩
কুরআন-হাদিসের আলোকে আল্লাহর অবস্থান	৫৩
চার ইমামের মতে আল্লাহর অবস্থান	৫৪
উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবস্থান	৫৫
আল্লাহর বিশেষণসমূহের ব্যাখ্যা	৫৭
ইসতিওয়া শব্দের ব্যাখ্যা	৫৯
আল্লাহর সাথে থাকার ব্যাখ্যা	৬০
ইল্লাল্লাহ-এর জিকির	৬৪
সম্মিলিত মোনাজাত	৬৬
অজুর মাসনুন দুআ	৬৯
ইস্তেঞ্জা	৭১
সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু বিদআত	৭২
বিদআতের পরিচয়	৭৩
বিদআতের পরিণতি ও বিদআত থেকে বাঁচার উপায়	৭৫
সুন্নাহ ও বিদআত একসাথে মিশ্রিত হলে করণীয়	৭৭
ধূমপান করা	৭৮
কবরের নিকট কুরআন তিলাওয়াত ও ওসিলা	৮১
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমল করার উপায়	৮২
তারাবির নামাজের রাকাত সংখ্যা	৮৪
রাসূল ﷺ-এর তারাবি	৮৪
তারাবি ও তাহাজ্জুদ একই নামাজ	৮৯

উমর (রা.) কর্তৃক প্রচলিত তারাবি	৯১
কোয়ানটিটি বনাম কোয়ালিটি	৯৪
তারাবি কত রাকাত পড়ব	৯৬
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অভিমত	৯৯
একটি হাদিসের সংশয় নিরসন	১০১
আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী (রহ.)-এর অভিমত	১০৫
তাকবিরে তাহরিমায় হাত উঠানোর পরিমাণ	১০৯
কাঁধ বরাবর হাত উঠানোর হাদিস	১১০
কান বরাবর হাত উঠানোর হাদিস	১১০
আমিন প্রসঙ্গ	১১৩
জোরে আমিন বলার হাদিস	১১৪
আস্তে আমিন বলার হাদিস	১১৫
ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া	১১৯
সূরা ফাতিহা পড়ার হাদিস	১১৯
সূরা ফাতিহা না পড়ার হাদিস	১২০
জাহেরি সালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ার হাদিস	১২১
একটি শিক্ষণীয় হাদিস	১২৪
জানাজা নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া	১২৫
রফউল ইয়াদাইন	১২৮
রফউল ইয়াদাইন করার হাদিস	১২৮
রফউল ইয়াদাইন না করার হাদিস	১২৯
সালাতে হাত বাঁধার বিধান	১৩৬
সালাতুল বিতর	১৩৯
বিতর সালাত সুন্নত না ওয়াজিব	১৩৯
বিতরের রাকাত সংখ্যা ও পড়ার পদ্ধতি	১৪৪

কুন্তের পূর্বে তাকবির দেওয়া ও হাত তোলা	১৫৪
দুআয়ে কুন্ত পাঠ	১৫৪
ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবির	১৫৮
১২ তাকবিরের হাদিস	১৫৮
ছয় তাকবিরের হাদিস	১৬০
পুরুষ ও মহিলার নামাজে পার্থক্য	১৬৩
মাজহাব প্রতিষ্ঠার অভিনব কৌশল	১৬৬
অন্ধ অনুসরণ ও অন্ধ বিরোধিতা	১৬৭
উপসংহার	১৭১
ধন্যবাদ	১৭২

ইফতিরাক বনাম ইখতিলাফ

ইফতিরাক (الافتراق) শব্দটি আরবি ‘ফারক’ থেকে গৃহীত। এর অর্থ—দলাদলি করা, বিভক্ত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি। এটি ‘ইজতিমা’ (الاجتماع) তথা জামাত, এক্যের বিপরীত। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا-

‘তোমরা এক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো। আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’

সূরা আলে ইমরান : ১০৩

ইফতিরাকের নিকটবর্তী আরেকটি শব্দ হলো ইখতিলাফ (الاختلاف)। এর অর্থ মতভেদ করা, মতানৈক্য করা, মতবিরোধ করা ইত্যাদি। ইফতিরাক ও ইখতিলাফের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ইখতিলাফ শরিয়তে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় নয়; বরং তা অনেক সময় প্রশংসিত হয়, কিন্তু ইফতিরাক সর্বদা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

কুরআন-হাদিসে বহু জায়গায় মুসলমানদের এক্যবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনৈক্য ও দলাদলি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ-

‘যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়। তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত।’ সূরা আনআম : ১৫৯
আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-

‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।’ সূরা আলে ইমরান : ১০৫

কুরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছে—

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

‘তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।’ সূরা রুম : ৩২
রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন—

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ-

‘তোমরা জামাত (ঐক্য) আঁকড়ে ধরবে এবং দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকবে।’^১
রাসূল ﷺ সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন—

‘আমার পরে অনেক ফিতনা দেখা দেবে। এ সময় যাকে দেখবে মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতকে বিভক্ত করতে চাচ্ছে, সে যে-ই হোক তোমরা তাকে হত্যা করবে।’^২

রাসূল ﷺ আরও বলেন—

‘পূর্ববর্তী উম্মতদের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। তা হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। আর বিদ্বেষ হচ্ছে মুণ্ডনকারী। আমি বলব না তা মাথার চুল মুণ্ডন করে; বরং তা দ্বীন মুণ্ডন করে।’^৩

এসব আয়াত-হাদিস থেকে বিভক্তি ও দলাদলির ভয়াবহতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

ইখতিলাফ বা মতভেদ দুই ধরনের। আকিদাগত মতভেদ ও ফিকহি মতভেদ। সাহাবিদের যুগ থেকেই এ দুই ধরনের মতভেদ চলে আসছে। আকিদাগত মতভেদ নিন্দনীয় ও দূষণীয় হওয়ায় তারা তা বর্জন করেছেন। কারণ, এটি অপরিবর্তনীয় ও স্থির। এখানে ইজতিহাদ করে কুরআন ও হাদিসের বাইরে কোনো মত বা আকিদা আবিষ্কারের সুযোগ নেই; কিন্তু ফিকহি মতভেদ দূষণীয় ও নিন্দনীয় নয়। তাই তারা তা বর্জন করেননি, তা বর্জনীয় বলে গণ্য করেননি। এক্ষেত্রে তাঁরা নিজের মতের পক্ষে দলিল পেশ করতেন, কিন্তু অন্যের মতকে বাতিল করতেন না। সুন্নত-মুস্তাহাব, ফরজ-ওয়াজিব; এমনকী হালাল-হারাম নিয়ে মতভেদ করা সত্ত্বেও তাঁরা একে অন্যকে অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন করতেন না। নিজের মত গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করতেন না। তারা ভিন্নমতসহ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতেন।

অথচ আজ আমরা ফিকহি মতভেদ নিয়ে মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। একে অন্যকে আক্রমণাত্মক কথা বলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ছি। ফিকহি দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আহলে হাদিস ও মাজহাবি নামে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ছি।

^১ তিরমিজি : ২১৬৫

^২ নাসায়ি : ৪০২০

^৩ তিরমিজি : ২৫১০

আল্লাহ কোথায় আছেন

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)সহ আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকিদা হচ্ছে—আল্লাহ তায়ালা সত্তাগতভাবে আরশের ওপরে রয়েছেন; তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। কুরআন-হাদিসের যেসব জায়গায় আল্লাহর হাত, আল্লাহর মুখ, আল্লাহর রাগান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, আল্লাহর আরশের ওপরে অবস্থান করা ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে, সেসব আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তার শাঙ্গিক অর্থ গ্রহণ করতে বলেছেন; কিন্তু আমরা নিজেকে হানাফি দাবি করে এসব আয়াত-হাদিসের ব্যাখ্যা করা জরুরি মনে করি। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাখ্যা না করার মতকে বিভ্রান্তিকর মনে করি। এখন আমরা আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে কুরআন-সুনাহ, চার ইমাম ও পূর্ববর্তী বড়ো বড়ো আলিমদের বক্তব্য নিয়ে পর্যালোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

কুরআন-হাদিসের আলোকে আল্লাহর অবস্থান

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى-

‘রহমান আরশের ওপরে সমাসীন।’^৪ সূরা ত্ব-হা : ০৫

রাসূল ﷺ বলেছেন

الْأَتَمُّنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبْرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً-

‘তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত বলে স্বীকার করো না? আমি তো ওই সত্তার নিকট বিশ্বস্ত, যিনি আকাশে রয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যা আমার নিকট আসমানের খবর আসে।’^৫

‘রাসূল ﷺ মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আসলামি (রা.)-এর দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন—“আল্লাহ কোথায়?” সে বলল—“আসমানে।” আল্লাহর রাসূল আবার জিজ্ঞেস করলেন—“আমি কে?” সে বলল, “আপনি আল্লাহর রাসূল।” রাসূল ﷺ মুয়াবিয়া (রা.)-কে বললেন— “তুমি তাঁকে আজাদ করে দাও। কারণ, সে ঈমানদার।”^৬

^৪ আল কুরআনের সাতটি স্থানে আল্লাহ তায়ালা আরশের ওপর সমাসীন হওয়ার কথা সরাসরি বর্ণিত হয়েছে। স্থানগুলো হলো—সূরা ইউনুস : ৩, সূরা রাদ-২, সূরা ত্ব-হা : ৫, সূরা ফুরকান : ৫৯, সূরা সিজদা : ৪, সূরা হাদিদ : ৪

^৫ বুখারি : ৪৩৫১; সহিহ ইবনে হিব্বান : ২৫

^৬ মুসলিম : ৫৩৭; সহিহ আবু দাউদ : ৯৩০; সহিহ ইবনে হিব্বান : ২৪৭

চার ইমামের মতে আল্লাহর অবস্থান

ইমাম আবু হানিফা (মৃ. ১৫০ হি.) আল ওয়াসিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন—

نَقَرُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ-

‘আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন এ অবস্থায় যে, আরশের প্রতি তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই এবং এর ওপর স্থির থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই।’^৭

তিনি আরও বলেন—

ان الله في السماء دون الأرض-

‘আল্লাহ তায়ালা আসমানে রয়েছেন, জমিনে নয়।’^৮

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন—

الله في السماء وعلمه في كل مكان؛ لا يخلو من علمه مكان-

‘আল্লাহ তায়ালা আসমানে রয়েছেন। তাঁর জ্ঞান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কোনো স্থানই তাঁর জ্ঞানশূন্য নয়।’^৯

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন—

إنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء-

‘আল্লাহ তায়ালা তাঁর আরশে রয়েছেন। সেখান থেকে তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন।’^{১০}

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন—

نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء-

‘আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা নিজ ইচ্ছানুযায়ী আরশের ওপর রয়েছেন।’^{১১}

তিনি আরও বলেন—

إنه مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ عَالِمٌ بِكُلِّ مَكَان-

‘আল্লাহ আরশের ওপর রয়েছেন আর তাঁর জ্ঞান সর্বত্র।’^{১২}

^৭ বদরুদ্দিন (৭৩৩হি.), ইজাহাদ দলিল, পৃষ্ঠা-৭৯

^৮ সানাউল্লাহ, তাফসিরে মাজহারি : ৫/৬

^৯ ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমুউল ফাতওয়া : ৫/৫৩, ১৩৯

^{১০} প্রাপ্ত : ৪/১৮১

^{১১} মুহাম্মদ বিন আদুর রহমান, ইতিকাদুল আইম্যাতুল আরবাআ, পৃষ্ঠা-৬৫

^{১২} মাজমুউল ফাতওয়া : ৪/১৮১

উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লাহর অবস্থান

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

اللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ-

‘আল্লাহ তায়ালা আরশের ওপর রয়েছেন, কিন্তু তোমাদের কোনো আমলই তাঁর কাছে গোপন নয়।’^{১৩}

ইমাম আবু আমর তালমুনকি (রহ.) বলেন—

إِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ اسْتَوَى بِذَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ-

‘আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ঐকমত্যে, আল্লাহ তায়ালা সত্তাগতভাবে আরশের ওপর সমাসীন।’^{১৪}

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)ও এই মত ব্যক্ত করেছেন।^{১৫}

হানাফি বিদ্বান ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.) (রহ.) বলেন—

نَعْرِفُ رَبَّنَا فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ عَلَى الْعَرْشِ-

‘আমরা জানি আমাদের রব সাত আকাশের ওপর আরশে রয়েছেন।’^{১৬}

ইমাম তিরমিজি (মৃ. ২৭৯ হি.) (রহ.) বলেন—‘তিনি আরশের ওপর ঠিক সেভাবে রয়েছেন, যেভাবে নিজ কিতাব আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও শাসন সর্বত্র রয়েছে।’^{১৭}

ইমাম আবু জারআ আল রাজি (রহ.) বলেন—‘তিনি আরশের ওপর রয়েছেন। তাঁর জ্ঞান সর্বত্র।’^{১৮}

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবু জায়িদও অনুরূপ অভিमत ব্যক্ত করেছেন।^{১৯}

এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকিদা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সত্তাগতভাবে আরশের ওপরে রয়েছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন; তবে তাঁর জ্ঞান গোটা বিশ্ব জগতকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

^{১৩} আত-তাওহিদ লিইবনু খুজাইমাহ : ২/৮৮৫; আল আসমা ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকি : ৮৫২; ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া : ৫/৫৫

^{১৪} মাজমুউল ফাতাওয়া : ৫/১৮৯

^{১৫} প্রাপ্ত : ৫/২৫৮

^{১৬} প্রাপ্ত : ৪/১৮১

^{১৭} প্রাপ্ত : ৫/৫০

^{১৮} প্রাপ্ত : ৫/৫০

^{১৯} প্রাপ্ত : ৪/১৮৯

আল্লাহর বিশেষণসমূহের ব্যাখ্যা

যারা বলেন—আল্লাহ তায়ালা সর্বত্র বিরাজমান, তারা আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কিত আয়াত-হাদিসসমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেন। তারা বলেন—‘ইসতিওয়া’ বা উর্ধ্বে অবস্থান বিষয়টি মুতাশাবিহ বা দুর্বোধ্য। মুহকাম বা স্পষ্ট নয়। অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হচ্ছে, আল্লাহর অবস্থান সুস্পষ্ট ও অকাট্য। কুরআন-হাদিস দ্বারা এর অকাট্যতা প্রমাণিত। তবে এর প্রকৃতি ও স্বরূপ অজ্ঞাত। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আরশে সমাসীন এটা জ্ঞাত ও সুস্পষ্ট, কিন্তু তিনি কীভাবে আছেন, তাঁর অবস্থানের ধরন ও প্রকৃতি কী ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের বোধগম্য নয়।

হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা প্রতিরাতে প্রথম আসমানে আসেন। কিন্তু তিনি কীভাবে আসেন, তা আমাদের জানা নেই; জানার প্রয়োজনও নেই। অজ্ঞাতকে অজ্ঞাত রেখে কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই তা বিশ্বাস করা মুমিনের কর্তব্য। নিম্নে এ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আলিমদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

উম্মে সালামা (রা.) সূরা ত্ব-হার পাঁচ নং আয়াতের তাফসিরে বলেন—

الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَيفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالْإِقْرَارُ بِهِ إِيْيَانٌ وَالْجُحُودُ بِهِ كُفْرٌ-

‘সমাসীন হওয়া অজ্ঞাত নয়। তবে এর ধরন আমাদের বোধগম্য নয়। এটি স্বীকার করা ঈমান। আর অস্বীকার করা কুফরি।’^{২০}

আল্লাহ তায়ালা আরশে সমাসীন হওয়ার হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন—‘আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে, এই হাদিস ও এর অনুরূপ অন্য হাদিসের ওপর কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই ঈমান আনা ওয়াজিব। এ হাদিসগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কেমন, কীরকম ইত্যাদি প্রশ্ন করা যাবে না।’^{২১}

^{২০} ইবনে হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি : ১৩/৪০৬; ফাতহুল কাদির : ২/২৪২

^{২১} বদরুদ্দিন আইনি, উমদাতুল কারি : ১৮/২৯৩

সালাতুল বিতর

বিতর নামাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এশার পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এ নামাজ আদায় করা যায়। এ নামাজের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُبِّ النَّعَمِ: الْوُتْرُ-

‘আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একটি সালাত দিয়ে সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হচ্ছে বিতরের সালাত।’^{২২}

বিতর সালাত সুন্নত না ওয়াজিব

বিতর নামাজ ওয়াজিব না সুন্নত, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে, বিতর নামাজ ওয়াজিব। তাঁর দলিল হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

الْوُتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا «قَالَهَا ثَلَاثًا»-

‘বিতর হলো সত্য। যে বিতর পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তিনি তিনবার এ কথা বলেছেন।’^{২৩}

হাদিসটিতে একই কথা তিনবার বলে বিতরের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। আর এ রকম গুরুত্ব কেবল ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এ ছাড়া রাসূল ﷺ আরও বলেছেন—

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرُ، يُحِبُّ الْوُتْرُ-

‘হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা বিতর পড়ো। কেননা, আল্লাহ বিজোড়। আর তিনি বিজোড় ভালোবাসেন।’^{২৪}

এ হাদিসে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর নির্দেশ ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করে। মাওলানা আব্দুর রহিম (রহ.) বলেন—‘হাদিসের ভাষ্য হলো, أَمَدَّكُمْ (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য

^{২২} তিরমিযি : ৪৫২। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন, হাদিসটি সহিহ লিগাইরিহি, মুসনাদে আহমদ : ৩৯/৪৪৪

^{২৩} আবু দাউদ : ১৪১৯। শাইখ আলবানি (মৃ ১৯৯৯ খ্রি.) বলেন—‘হাদিসটি দুর্বল। এই হাদিসের সনদে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আতাকি নামে একজন রাবি রয়েছে। তিনি রাবি হিসেবে দুর্বল।’ (জইফ আবু দাউদ লিল আলবানি : ২/৮১)। ইবনে মাইন (মৃ ২৩৩ হি) তাঁকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। ইমাম হাকিমও (মৃ ৪০৫ হি.) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। উমদাতুল কারি, ৭/ ১১। শুয়াইব আরনাউতের মতে, হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি। তাখরিজ, আবু দাউদ : ১৪১৯

^{২৪} আবু দাউদ : ১৪১৬, নাসায়ি : ১৬৭৫

করেছেন)।’ এ থেকে বোঝা যায়, বিতর নামাজের ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করেছেন; রাসূল ﷺ করেননি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যা করতে বলা হয়, তা ওয়াজিব হয়; নফল হয় না।^{২৫}

ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)সহ অধিকাংশ আলিমের মতে, বিতর সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ওয়াজিব নয়। কাজি আবু তাইয়্যিব বলেন—

إِنَّ الْعُلَمَاءَ كَافَّةً قَالَتْ: إِنَّهُ سَنَةٌ، حَتَّى أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَحْدَهُ: هُوَ وَاجِبٌ
وَلَيْسَ بِفَرَضٍ-

‘সমস্ত আলিমের ঐকমত্যে বিতর সালাত সুন্নত; এমনকী আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের অভিमतও এটি। শুধু আবু হানিফা (রহ.) এককভাবে বিতর নামাজকে ওয়াজিব বলেছেন, ফরজ নয়।’^{২৬}

আবু হামিদ আল গাজ্জালি বলেন—

الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب، وبه قالت الإمامة كلها إلا أبا حنيفة-

‘বিতর সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। আবু হানিফা (রহ.) ছাড়া ইমামদের সবাই এ কথা বলেছেন।’^{২৭}

তঁারা দলিল হিসেবে বলেন—‘রাসূল ﷺ আহলে কুরআনদের বিতর পড়তে বলেছেন। আর আহলে কুরআন বলতে হাফিজ, আলিম ও ক্বারিদের বোঝায়।^{২৮} যদি বিতর ওয়াজিব হতো, তাহলে তা সবাইকে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হতো।’

আলি (রা.) বলেন—

الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم-

‘বিতর তোমাদের ফরজ নামাজের মতো অত্যাৱশ্যক নয়। তবে রাসূল ﷺ তা সুন্নতরূপে প্রবর্তন করেছেন।’^{২৯}

তিনি আরও বলেন—‘বিতর পড়া ফরজ নামাজের মতো অনিৱাৰ্য নয়; বরং এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নত।’^{৩০}

ইবনে মুনজির বলেন—

لَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي هَذَا-

^{২৫} মাওলানা আব্দুর রহিম, হাদিস শরিফ, (খাইরুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩ প্রকাশ, ২০০৮), ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা-১৩৯

^{২৬} উমদাতুল কারি : ৭/ ১১

^{২৭} উমদাতুল কারি : ৭/১১

^{২৮} মাওলানা আবদুর রহীম, হাদিস শরিফ : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৯

^{২৯} তিরমিজি : ৪৫৩

^{৩০} তিরমিজি : ৪৫৪

‘আমি এমন কারও কথা জানি না, যিনি এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে একমত হয়েছেন।’^{৩১}

ইমাম ইবনে বাত্তাল বলেন—

الوتر واجب على أهل القرآن دون غيرهم، لقوله عليه السلام: (أوتروا يا أهل القرآن)، روى ذلك عن ابن مسعود، وحذيفة وهو قول النخعي-

‘বিতর শুধু আহলে কুরআনদের ওপর ওয়াজিব, অন্যদের ওপর নয়। কেননা রাসুলের বাণী হলো—“হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা বিতর পড়ো।” ইবনে মাসউদ ও হুজাইফা (রা.) থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাখায়ির অভিमतও তা-ই।’^{৩২}

তিনি আরও বলেন—‘আলি ও উবাদা ইবনে সাবিত (রা.)-এর মতে, বিতর সালাত সুন্নত। সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব, হাসান, শাবি ও ইবনে শিহাব জুহুরি (রা.)-এর মতও অনুরূপ।’^{৩৩}

^{৩১} নববি : ৪/১৯; সাইয়েদ সাবিক, ফিকহুস-সুন্নাহ : ১/১৯২

^{৩২} প্রাগুক্ত

^{৩৩} শরাহ, বুখারি : ২/৫৮০

ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবির

বর্তমান সমাজে ঈদের তাকবির সংখ্যা নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে; এমনকী এটাকে কেন্দ্র করে বিভক্তি, দলাদলি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা জরুরি মনে করছি।

১২ তাকবিরের হাদিস

ঈদের সালাতে ১২ তাকবির বলার হাদিস ছয়টি সনদে বর্ণিত হয়েছে। ১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে।^{৩৪} ২. আম্মার ইবনে সাদ (রা.) থেকে।^{৩৫} ৩. আমর ইবনে আউফ (রা.) থেকে।^{৩৬} ৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে।^{৩৭} ৫. আমর ইবনে শুরাইব (রা.) থেকে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।^{৩৮} ৬. ইবনে লাহিয়া (রহ.)-এর বর্ণনা।

এসব সনদে ১২ তাকবিরসংক্রান্ত যতগুলো মারফু^{৩৯} হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই দুর্বল। এর একটি হাদিসও পরিপূর্ণ সহিহ সনদে বর্ণিত হয়নি।^{৪০}

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন—

لَيْسَ يُرْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

‘দুই ঈদের তাকবিরসংক্রান্ত একটি সহিহ হাদিসও রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি।’^{৪১}

তবে এ ব্যাপারে মাওকুফ^{৪২} বা সাহাবিদের কর্মসংক্রান্ত একাধিক সহিহ হাদিস পাওয়া যায়। এগুলো সাহাবিদের কর্ম হলেও তা রাসূলের শিক্ষা ও নির্দেশনা হিসেবে গণ্য। কেননা, আল্লাহর রাসূলের শিক্ষা ছাড়া সাহাবিরা নিজ থেকে কোনো কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন বলে কল্পনা করা যায় না।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন—‘আমি শুনেছি, নাফে (রহ.) বলেছেন—“আবু হুরায়রা (রা.)-এর সাথে আমি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাজ পড়েছি। তিনি প্রথম রাকাতে কিরাতের পূর্বে সাত তাকবির দিয়েছেন। দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর পাঁচ তাকবির বলেছেন।”’^{৪৩}

^{৩৪} তাবরানি, আল মুজাম্মুল কাবির : ১০৭০৮

^{৩৫} ইবনে মাজাহ : ১২৭৭

^{৩৬} তিরমিজি : ৫৩৬

^{৩৭} দারেকুতনি : ১৭৩২

^{৩৮} ইবনে মাজাহ : ১২৭৮

^{৩৯} যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনাধারা রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌছেছে; অর্থাৎ যে হাদিসে রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

^{৪০} দেখুন, শাওকানি, নাইলুল আওতার : ৩/৩৫৪

^{৪১} মুসনাদে আহমদ : ১১/২৮৫

^{৪২} যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনাধারা সাহাবিদের পর্যন্ত পৌছেছে; অর্থাৎ যে হাদিসে সাহাবিদের কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ হাদিস বলে।

হাদিসটির সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। কেননা, হাদিসটি ইমাম মালেক নাফে (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হলেন প্রসিদ্ধ ফকিহ, বিশুদ্ধতম হাদিস বর্ণনাকারী। তাঁর ওস্তাদ নাফে (রহ.)ও তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সহিহ হাদিস বর্ণনাকারী, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ। অতএব, তা সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই।

আতা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন—‘তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) ঈদের সালাতের প্রথম রাকাতে তাকবিরে তাহরিমাসহ সাত তাকবির বলতেন। দ্বিতীয় রাকাতে রুকু তাকবিরসহ ছয় তাকবির বলতেন। আর তাকবিরগুলো বলতেন কিরাতে আগেই।’^{৪৪}

শাইখ আলবানি (রহ.) বলেন—

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين-

‘বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদিসটির সনদ সহিহ।’^{৪৫}

এ হাদিসে প্রথম রাকাতে তাকবিরে তাহরিমাসহ সাত তাকবির ও দ্বিতীয় রাকাতে রুকু তাকবিরসহ ছয় তাকবিরের কথা বলা হয়েছে। এ হিসেবে অতিরিক্ত তাকবির সংখ্যা হয় ১১টি। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ১০ তাকবিরের হাদিসও বর্ণিত আছে। সে হাদিসের সনদও সহিহ।

ছয় তাকবিরের হাদিস

ছয় তাকবিরের ব্যাপারে সহিহ সনদে বর্ণিত কোনো মারফু হাদিস নেই। তবে অনেক মাওকুফ হাদিস রয়েছে, যেগুলোর সনদ সহিহ। তা থেকে দুটি হাদিস উল্লেখ করছি—

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত—‘তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.) ঈদের সালাতে) নয়বার তাকবির বলতেন। প্রথম তাকবির বলে নামাজ শুরু করতেন। এরপর অতিরিক্ত তিন তাকবির বলে কুরআন পড়তেন। পঞ্চম তাকবির বলে রুকু করতেন। এরপর সিজদা করতেন। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তেন। পড়া শেষে অতিরিক্ত তিন তাকবির বলতেন। চতুর্থ তাকবির বলে রুকুতে যেতেন।’^{৪৬}

অর্থাৎ, তাকবিরে তাহরিমা ও রুকু তাকবির বাদ দিলে অতিরিক্ত তাকবির সংখ্যা হয় মোট ছয়টি। এ হাদিসটি মুসলিম শরিফের শর্তানুযায়ী সহিহ। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে সহিহ সনদে এ রকম আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

^{৪৩} মালিক বিন আনাস, আল মুয়াত্তা : ৬১৯

^{৪৪} মুসান্নাফে আব্বা শাইবা : ৫৭০৪

^{৪৫} ইরাউল গালিল : ৩/১১১

^{৪৬} মুসান্নাফে আব্বা শাইবা : ৫৬৯৯

পুরুষ ও মহিলার নামাজে পার্থক্য

পুরুষ ও মহিলার সালাতে বিধানগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে পদ্ধতিগত কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। আমাদের সমাজে যেসব পার্থক্য প্রচলিত, তা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শুধু সিজদায় পার্থক্যের ব্যাপারে একটি মুরসাল হাদিস রয়েছে। বিশিষ্ট তাবেয়ি ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব (রহ.) বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فَضْمًا بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيَسْتُكَالِرُ الْجُلَّ-

‘একবার রাসূল ﷺ নামাজরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন—তোমরা সিজদার সময় শরীরকে জমিনের সাথে মিলিয়ে দেবে। কেননা, এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো নয়।’^{৪৭}

হাদিসটি মুরসাল সহিহ।^{৪৮} ইবনে মুলকিন বলেন—‘হাদিসটি সহিহ অথবা হাসান (গ্রহণযোগ্য)।’^{৪৯}

মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, তাবেয়ি যদি বিশ্বস্ত হন, শুধু বিশ্বস্ত রাবি থেকেই হাদিস বর্ণনা করেন, তাহলে তাঁর হাদিস গ্রহণযোগ্য।^{৫০}

সনদ সহিহ হলে ফকিহদের প্রায় সবাই মুরসাল হাদিস গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজনে মুরসাল হাদিস দিয়ে দলিলও দিয়েছেন; কিন্তু আহলে হাদিসের শাইখগণ মুরসাল হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করেন। শাইখ আসাদুল্লাহ আল গালিব ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইতে বিতর নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—‘আল্লাহুমা ইন্না নাসতাইনুকা... বলে বিতরে যে কুনুত পড়া হয়, সেটা মুরসাল বা জয়িফ হাদিস।’^{৫১}

তাঁর কাছে ‘মুরসাল’ মানেই জয়িফ। অথচ আমরা পূর্বে দেখেছি—‘মুরসাল হাদিস যেমন জয়িফ হতে পারে, অনুরূপ সহিহও হতে পারে। বুকে হাত বাঁধার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে স্থান উল্লেখপূর্বক একটি সহিহ হাদিস রয়েছে। আর তা মুরসাল। আহলে হাদিসরা ঠিকই সে হাদিসকে দলিলরূপে গ্রহণ করেছে।

^{৪৭} বায়হাকি, সুন্নে কুবরা : ৩২০১

^{৪৮} তাবেয়ি যদি সাহাবির নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূল ﷺ-এর নাম উল্লেখ করে হাদিস বর্ণনা করেন, তাহলে তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

^{৪৯} ইবনু মুলকিন, তুহফাতুল মুহতাজ : ১/৩১৮

^{৫০} ড. মাহমুদ তুহান, তাইসির মুসতাহিল হাদিস, (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ) পৃষ্ঠা-৪৯

^{৫১} মোহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), (হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী, ৪র্থ সংস্করণ) পৃষ্ঠা-১৬৯

শাইখ মুজাফফর বিন মুহসিন ‘জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর ছালাত’ বইতে এ মুরসাল হাদিসকে জোরালোভাবে সহিহ বলেছেন।

বুকে হাত বাঁধার মুরসাল হাদিসকে হানাফিরা আবার দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ মহিলাদের নামাজের পার্থক্যের ক্ষেত্রে ওপরের মুরসাল হাদিসটি একবাক্যে সহিহ বলেছেন।

মাজহাবি ও আহলে হাদিস কোন্দল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা এখান থেকেই সহজে অনুমান করা যায়।

মহিলাদের নামাজের ক্ষেত্রে পাঁচটি পার্থক্য দেখা যায়। ১. কাঁধ বরাবর হাত উঠানো। ২. বুকে হাত বাঁধা। ৩. রুকুতে একটু ঝাঁকা। ৪. জড়োসড়ো হয়ে সিজদা করা। ৫. বৈঠকে ডান দিকে পাবের করে নিতম্বের ওপর বসা।

এ পাঁচটির মধ্যে প্রথম দুটি নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। তাতে দেখেছি, তাকবিরের সময় হাত তোলা ও হাত বাঁধার ব্যাপারে ইসলামের প্রথম যুগে কোনো পার্থক্য ছিল না। সিজদায় পার্থক্যের ব্যাপারটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। পরবর্তী অনেক আলিমও এ ব্যাপারে মত দিয়েছেন।

হাসান বসরি ও কাতাদা (রহ.) বলেন—‘মহিলারা সিজদার সময় যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে থাকবে। কোমর উঁচু রেখে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝাঁকা রাখা অবস্থায় সিজদা দেবে না।’^{৫২}

রুকু ও বসার ব্যাপারেও দুয়েকটি হাদিস রয়েছে, কিন্তু সেগুলো দুর্বল।^{৫৩} তারপরও অনেক ফকিহ মহিলাদের জন্য এসব পার্থক্যের কথা বলেছেন। কারণ, মহিলাদের আবর ও সতর হেফাজতের জন্য তা বেশি উপযোগী। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন—

وَقَدْ أَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَى النِّسَاءَ بِالِاسْتِتَارِ وَأَدَّبَهُنَّ بِذَلِكَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَتُلْصِقَ بَطْنَهَا بِفَخْذَيْهَا وَتَسْجُدَ كَأَنَّهَا مَا يَكُونُ لَهَا وَهَكَذَا أُحِبُّ لَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ وَجَمِيعِ الصَّلَاةِ أَنْ تَكُونَ فِيهَا كَأَنَّهَا مَا يَكُونُ لَهَا-

‘আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলের শিক্ষাও ছিল অনুরূপ। তাই আমার কাছে পছন্দনীয় হলো, সিজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গ মিলিয়ে রাখবে। পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে নেবে। এমনভাবে সিজদা করবে, যাতে সতর পূর্ণ আবৃত থাকে। রুকু, বৈঠক, এককথায় সম্পূর্ণ নামাজে এমনভাবে থাকবে, যাতে সতরের পুরোপুরি হেফাজত হয়।’^{৫৪}

^{৫২} মুসান্নাফে আব্বি শাইবা : ৫০৬৮

^{৫৩} সুয়ুতি, জামিয়ুল হাদিস : ১৭৫৮; মাওকিয়ুল ইসলাম : ৯২৭৬

^{৫৪} শাফেয়ি, আল উম্ম : ১/১৩৮